Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 63-70
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'ভাতের গন্ধ': অন্তরঙ্গ পাঠ বিশ্লেষণ

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি
অতিথি অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ, দুর্গাপুর,ও কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

One of the famous Bengali writers is Prafulla Roy .He is a real gem of Bengali Literature. He was uprooted from his motherland; that's why, in his writing mostly we found- hardly struggling people, untouchables, tribal peoples, rootless, de-centered peoples. He was not that kind of upper level sophisticated writer, who was not only sympathized the struggling peoples; he was experiences of their living style-with them. He was really felt for them. In Prafulla Roy's novel 'vater gondho' –we saw some struggling people they were not got their primary food, such as rice (vat). We, the so called high society, or middle class people not even thought of their struggle. This novel we found that, marginal peoples were travelling here and there for vat (rice); Most of the time they were failed. In the end of the novel they got 'vat'. Novelist painted some mesmerizing moments throughout this novel, it's never forgettable. Why this novel different from other novel? We are trying to finding some positive answer-through this article. What novelist wants to tell us in this novel? In this novel only stacked the searching of rice (vat) or it's beyond that? In this article, we Thorley discuss about that.

Keywords: Searching, Struggling, Suffering, Reality, Humanity.

প্রফুল্ল রায় বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মগ্রহন করেছিলেন ১লা জানুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। দেশভাগ হয়ে যখন ভারত, পাকিস্থান আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করল; তখন লেখক প্রফুল্ল রায় ভারতবর্ষে পাকাপাকি ভাবে চলে আসেন। ছিন্নমূল একজন মানুষের মূল বা শিকড়ের জন্য যে টান ,সেই যন্ত্রণার ছবি আমরা বার-বার প্রফুল্ল রায়ের লেখায় খুঁজে পেয়েছি। নতুন জায়গায় আসার পর তাঁর পায়ের তলায় কোনো শক্ত মাটি ছিল না ,তাঁকে ভাগ্যন্বেষণের চেষ্টায় প্রচুর ঘুরতে হয়েছে।

'প্রফুল্ল রায়' নামটি উচ্চারণ করা মাত্রই আমরা ,একঝোঁকে 'কেয়াপাতার নৌকা' উপন্যাসের কথা বলি। এই মহাকাব্যোপম উপন্যাসটি ছাড়াও তাঁর আরো অসংখ্য লেখালিখি রয়েছে।

তিনি বিভিন্ন জাতি , উপজাতি, তফসিলি প্রজাতিদের নিয়ে তাঁর ঐকান্তিক নিরলস প্রচেষ্টায় লিখে গেছেন ছোটগল্প,উপন্যাসগুলি। নাগাল্যান্ডের অধিবাসিদের নিয়ে তিনি লিখলেন আঞ্চলিক উপন্যাস

'পূর্বপার্বতী' ,এছাড়াও বিহার, আন্দামানের উপজাতিদের নিয়ে লিখছেন তাঁর লেখাগুলি। প্রচুর লিখেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় ১৫০-ও বেশি ।

প্রফুল্ল রায়ের একেবারে অনালোচিত একটি উপন্যাস 'ভাতের গন্ধ'। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটির, প্রতি পরতে-পরতে নৃশংস বাস্তবতার ছবি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। এই সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে আমরা কেতাদুরস্ত মধ্যবিত্তরা খুব বেশি পরিচিত নই। আমাদের চির চেনা ভাবনার চৌহদ্দিতে এই বাস্তবতাকে আমরা ঠিক মেলাতে পারি না।

বিহারের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ সম্প্রদায়কে নিয়ে ঔপন্যাসিক যে উপন্যাসটি রচনা করলেন তা আমাদের বিস্মিত করে তোলে। বছর চল্লিশ- বেয়াল্লিশের দূর্বল,কমজোর,হাড্ডিসার চেহারার অধিকারী ধানোয়ার দুটো ভাতের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে সমগ্র উপন্যাসে। তার সঙ্গে –সঙ্গেই যাযাবরের মতো ঘুরেছে –লাখপতিয়া,তার বৃদ্ধ শাশুড়ি, জাতিতে তাতমা রামনৌসেরা, সখিলাল,তার বউ সাগিয়া,তাদের দুটি বাচ্চা, ফির্তুরাম,তার বউ ,বাচ্চা, টহলরাম,তার মা, সোমবারী, রাতুয়া, মুঙ্গেরিলাল, বিরিজ, পরসদী, তার দুটো বাচ্চা আরও অনেকে। নাম গুলোর সঙ্গেই ধাতস্থ হতে আমাদের বিষম খেতে হয়। কিন্তু 'ভাতের গন্ধ' উপন্যাসটিতে এইসব ভবঘুরে, যাযাবর চরিত্ররাই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এখন আমরা নিম্নবর্গ বা 'Subaltern Study' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি,অথচ লেখক প্রফুল্ল রায় সেই কতদিন আগেই এই দুঃদর্শাগ্রস্ত মানুষদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে টিকে থাকার ছবিটিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ধানোয়ার, লাখপতিয়া, রামনৌসেরা প্রমুখ প্রান্তিক মানুষেরা কেন্দ্রের একেবারে বাইরে অবস্থান করে। সমাজের কেন্দ্রে অবস্থানকারী মানুষেরা তাদের বিচ্ছিন্নই করে রেখে দিয়েছে।

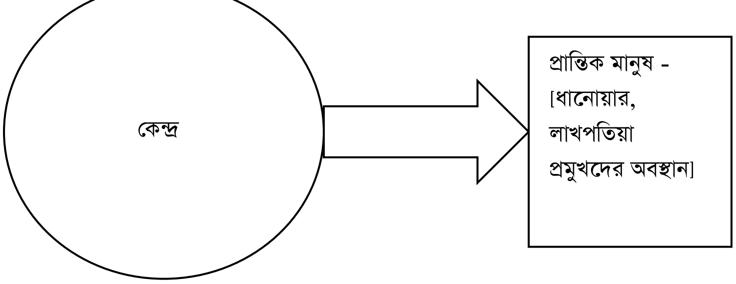

জমির মালিক; সামন্তপ্রভুরা তাদের অন্নের দানার এক অংশও দিতে রাজি হয় না। তাই তারা প্রান্তিক, বিচ্ছিন্ন ভুখা মানুষ হিসাবেই থেকে যাচ্ছে –তাদের অবস্থানের কোনো বদল হয় না।

যদি দেখা যাই, বাংলা সাহিত্যে এই 'Harsh Reality'– র দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দুটো ভাতের জন্য যে হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছিল -আকাশে, বাতাসে কান পাতলেই তা যেন কানে আসে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে লেখেন-

> "মুন্ডাদের জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুন্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন। কোনো না কোনো ভাবে ভাত বিরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বেশির ভাগ

সময়েই বিরসার যে উদ্ধত ঘোষণা, "মুণ্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মতো ভাত খাবে না?" আর তেসরা ফেব্রুআরি বিরসা ধরা পড়েছিল ওরা ভাত রাঁধছিল বলে"। [১]

মহাশ্বেতা দেবীর 'সাঁঝ-সকালের মা' ছোটগল্পে জটি ঠাকুরনীর মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধের কাজ যখন চলছিল,জটির পুত্র সাধন, পুরোহিতকে প্রদেয় চাল উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। সে বলতে থাকে-

"ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ- সকালের মা বাঁধা থাকবে"। [২]

'ভাত' - প্রাথমিকভাবে, জীবন ধারণের জন্য অন্যতম একটি খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতাটি মনে পড়ে যাচ্ছে –

"আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির-আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত"। [৩]

'ভাতের গন্ধ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় বলেছেন-

"গরম ভাতের সুগন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে শরীরের শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে যেতে থাকে।হো রামজী, কত কাল সে ভাত খায় নি"।[৪]

শীতের একেবারে শুরুর দিকে বিহারের একেবারে প্রান্তে হাওয়ায় প্রচুর হিমের কণা যেন মিশে গেছে। কিছু যাযাবর, ভুখা মানুষ ভাতের সন্ধানে চলেছে। বাজরার রুটি, মকাই, সুথনি, ছাতু ,বাসি লিট্টি খেয়েই তাদের দিন গুজরান হয়। বছর চল্লিশ- বেয়াল্লিশের ধানোয়ার- এত বড় পৃথিবীতে যার নিজের বলে কেউ নেই, গভীর অসুখে ভুগে শরীরেও কিচ্ছু নেই। শুধু দুই মুঠো ভাতের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাখপতিয়া তার স্বামী মারা যাওয়ায় আর বিয়ে করেনি তার শাশুড়িকে একা ফেলে রাখবে না বলে ,সেই শাশুড়িকে নিয়েই দুটো ভাতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। রামনৌসেরা, সখিলাল, ফির্তুরাম, টহলরাম, সোমবারী, মুঙ্গেরিলাল, পরসদী- প্রায় পঞ্চাশ জনের একটা দল ভাতের তলাশ করতে বেরিয়ে পড়েছে। আরো ছোট –ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভুখা, হাভাতে, আধা নাঙ্গা মানুষের জমায়েত। বড় বড় ক্ষেত-খামারের মালিকদের কুইন্ট্যাল,কুইন্ট্যাল ধান যখন গোলায় ওঠে তখন তাদের মেজাজ ফুরফুরে থাকে,সেই কয়েকটা দিন পেট ভরে খাওয়ার ক্ষীণতম ভরসা থাকে। সেই আশাতেই প্রত্যেকটা মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে। ক্ষুধাতুর চোখগুলো শুধুই স্বপ্ন দেখে ভাতের স্বপ্ন।

"বহোত ধান যখন হয়েছে তখন বহোত ভাত খেতে পাব-নায়? হাঁ – হাঁ-।" [৫]

মাটির রাস্তার ধারে অনেকগুলি সিমার আর কড়াইয়া গাছের তলায় শীতের রাতের ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেয় সকলে। এমনই দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ভাতের সন্ধানে আসা ক্ষুধার্ত মানুষেরা। বিশাল-বিশাল ধানের ক্ষেতগুলোয় তখন ধান কেটে জমি মালিকদের খোলানে পৌঁছানোর কাজ চলছিল জোরকদমে। ধানোয়ারের দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য রামনৌসেরা জানিয়ে দেয় ,ধান জমি থেকে কাটা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে,

ততক্ষণ পর্যন্ত মাঠে নেমে ধান সংগ্রহ করা যাবে না। জমিদারের পাহারাদারেরা নয়তো অত্যাচার চালাবে। তারা সকলে মিলে ঠিক করে খোসা ছাড়িয়ে যে চাল পাওয়া যাবে তা দিয়েই তারা সকলে কিছুদিন অন্তত তো দু'বেলা ভাত খেতে পারবে।

শীতের রাত, হিমের মতো ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নিচে থাকা, মাঠে টহলদারদের চোখ রাঙানি, এতজন ভুখা মানুষের দল, পেটে আসীম ক্ষুধার তাড়না নিয়ে বেঁচে থাকা- পরিশীলিত মানুষ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এই যন্ত্রণার কথা।

একজন সহৃদয় পাহারাদার তাদের বলে; বড়,বড় জমির মালিকদের কাছে গিয়ে তাদের জমিতে ধান কাটার কাজে নিযুক্ত করবার অনুমতি গ্রহন করতে।

ধানোয়ারদের দল সকাল বেলায় উঠেই জমির মালিক রাজপুত ক্ষত্রিয় ত্রিলোকী সিং-এর কাছে যায়। ত্রিলোকী সিং স্পষ্ট বলে দেয় –

"গিরধর ভূচ্চরগুলোকে বলে দে, কামটাম মিলবে না।"[৬]

এমনকি ভুখা মানুষদের মানুষ বলেও জ্ঞান করে না ত্রিলোকী সিং-এর মতো মানুষরা। লাথি মেরে ফেলে দিতে নির্দেশও দেন। এখানেই তারা থেমে থাকে না। একে –একে তারা আরো তিনজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ ভানচন্দ্র ঝা, কায়াথ বজরঙ্গী সহায়, ও ঝামরলাল গোয়ারের কাছে যায়। তারা কেউ তাদেরকে কোনো কাজ দেন না। ধানকাটাইয়ের কাজ করে ভাত খাবার আশাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার এই মানুষগুলির অসহায়ত্বকে খুব কাছ থেকে দেখে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে লিখেছেন। তবু এইসব অসহায় ,যাযাবর, ক্ষুধার্ত মানুষেরা –

> "আদিগন্ত ধানক্ষেতের ধারে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় শীতের বিকেলে যে বিশ পঁচিশটা ভুখা আধানাঙ্গা মানুষ গা জড়াজড়ি করে বসে আছে, দু'দিন আগেও তারা কেউ কাউকে দেখেনি পর্যন্ত। বিহারের জেলায় জেলায় বহুদূরের সব গাঁয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। পরস্পরের অচেনা এইসব লোকেরা ভাতের খোঁজে এখানে এসে একই পরিবারের মানুষ হয়ে গেছে; আর রামনৌসেরা যেন তাদের মুরুব্বি"।[৭]

একে অপরের সঙ্গে তারা মিলে মিশে থাকতে শুরু করে।

যে ভাতের খোঁজে তারা বেরিয়েছিল তার যোগাড়ে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে না। নিজেদের সাথে বয়ে নিয়ে আসা খাবারের পরিমাণ-ও প্রায় তলানিতে এসে ঠেকে। প্রত্যকের কপালেই স্পষ্ট হতে ঠাকে চিন্তার ভাঁজ। লাখপতিয়ার অবুঝ শাশুড়ি চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, ভাত তার আর খাওয়া হবে না বলে বিলাপ করতে থাকে। পরসাদীর দুটো ছেলে অঝোর ধারায় খিদের চোটে কান্না জুড়ে দেয়। এলোপাথাড়ি মার মারতে থাকে পরসাদী তার ছেলে দুটোকে। ছেলে দুটোকে মারতে থাকে কারণ, সে অসহায়-ছেলে দুটোর মুখে একটু অন্ন যোগাড়ে অক্ষম এক মা। ধানোয়ার নিজের খাবারের থেকে একটা মকাই আর সেদ্ধ করা মেটে আলু দেয়, পরসাদীকে তা নিজে খেয়ে, বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর কথা বলে। এই অসহায়, দীন-দুঃখী মানুষগুলো একে অপরের ঢাল হয়ে ওঠে। দুর্গত মানুষেরাই একে অন্যের দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়। হাড় কাঁপানো শীতের ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে যাই সকলে। কিন্তু শীতে তাদের মৃত্যু নেই। পেটের ভুখেই তাদের মরণ লেখা আছে। মাঠের পাহারাদারেরা তাদের সর্বদায় সাবধান করে দেয় –

" 'ভুখে মরিস তো মরবি। কোই পরোয়া নেই। মগর হোঁশিয়ার-। কেউ ক্ষেতিতে নামবি না ।' " [৮] এ কোন্ মানবিকতার দৃশ্য? বড্ড নিশংস এই ছবি। পেটে ক্ষুধা নিয়ে ভুখা মানুষ গুলো মরে গেলেও কারোর কিছু যাই আসে না। কিন্তু জমিদারের ক্ষেতে নামলে তাদের শেষ করে দেবার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

দলের সকলে মিলে ঠিক করে যে, তারা এবার জঙ্গলের ফলমূল, পাখি যা পাবে সেগুলোকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহন করবে । যতক্ষণ না পর্যন্ত মাঠের সব ধান তোলা হচ্ছে, ঠিক হয় এই ব্যবস্থা মতোই তারা সবাই চলবে।

রামনৌসেরা সকলের মনে কৌম চেতনার বীজ বপন করে দিতে চাই। হয়তো গোষ্ঠীই পারে শিকড়্গুলোকে শক্ত করে ধরে রাখতে। রামনৌসেরা বলতে থাকে -

"একসাথ হামনিলোগ ইধর (এখানে) আয়া।কিছু মেলে তো একসাথে ভাগ করে খাব। নায় মিলল তো নায় খায়েগা"।[৯]

ধানক্ষেত থেকে বহুদূরের জঙ্গলে খাদ্যের যোগাড় করার জন্য যেতে শুরু করে ভুখা মানুষের দলটি । ভয়ানক জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করেই চলতে থাকে খাদ্যের অনুসন্ধান। নিঝুম বনভূমিতে পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য চলতে থাকে কঠোরতর সংগ্রাম। ধানোয়ার তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগ করে সংগ্রহ করেই ফেলে 'বাগনর' বা কলার ঝাড়। আর ঠিক তখনই একটি বিরাট বিষধর সাপ তার ছোবল দিতে উদ্যত হয় ধানোয়ারকে। সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ,থাকতে সাপটি একসময় চলে যায়। ধানোয়ার সে যাত্রা বেঁচে যায়। তাই হয়তো ঔপন্যাসিক লিখলেন-

> "এই পৃথিবীতে তাদের মতো হাভাতেদের এত সহজে পেটের দানা জোটে না। দুনিয়ার সব খাদ্য কেউ না কেউ আগলে বসে থাকে। ওখানে পাকা ধানের ক্ষেত পাহারা দেয় পেহলবানেরা আর বাগনরের ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মারাত্মক গেহুমন সাপ"। [১০]

খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে, ঘুরতে দাঁতাল, শুয়োর, চিতা বাঘ, বুনো মোষ- এর মতই মারাত্মক জন্তু জানোয়ারদের কবলে তাদের অনেকবারই পড়তে হয়েছে। এ-এক কঠোর সংগ্রামের জীবন্ত চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এইসব নিঃস্পৃহ বাস্তবতার ছবি আমরা বাংলা উপন্যাসে খুবই কম দেখেছি।

আস্তে-আস্তে জঙ্গলের খাবার ও ফুরিয়ে আসতে থাকে। এরমধ্যেই নতুন একটা হাভাতের দল ধানোয়ারদের জায়গা দখল করতে এলে তুমুল গণ্ডগোল বেঁধে যায়। তারা প্রথমে লড়াই ঝগড়া করলেও পরে একসাথে দুটো দল মিশে যায়।

ভাতের জন্য ঘুরতে থাকা ধানোয়ার, মুনোয়ারপ্রসাদের মতো ভুখা মানুষদের কাছে ইহজগৎ-এর সব থেকে কাম্য বস্তু হল ধান। ক্ষুধার তাড়নায় এই ধানেরই প্রয়োজন পড়ে। মুনোয়ারপ্রসাদ –এক অদ্ভুত মানুষ। দিনের পর দিন শুধুমাত্র ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেন। এইভাবেই ধান দেখাতেই তার সুখ। প্রায় দু-পাঁচ শো রকমের ধানের নাম সে অনর্গল বলতে পারে। পরের ক্ষেতে কাজ করেই সে ধান চিনে নিয়েছে। ধান দেখেই সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে ;একথা ধানোয়ারকে সে জানিয়ে দিয়েছে। পেটে ভাতের দানা পড়ুক আর না পড়ুক ঔপন্যাসিক এক অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করলেন, যে শুধুমাত্র ধান

দেখেই অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তির ,সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনকে নির্বাপিত করতে সক্ষম। মুনোয়ারপ্রসাদ সমগ্র উপন্যাসে স্মরণীয় একটি চরিত্র।

> "বিপুল উৎসাহে এবং আবেগের গলায় এমন নানা জাতের, নানা রঙের, নানা আকারের কত যে ধান দেখিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ তার হিসাব নেই। এইসব ধান কখন কোন তিথিতে কীভাবে রোয়া হয়, সমস্ত কিছু তার মুখস্থ। শুধু তাই না, কোন ধানের ভাতে, চিড়েতে বা মুড়িতে কীরকম আস্বাদ, সব তার জিভে লেগে আছে। ধান নামে পৃথিবীর এই প্রাচীন শস্যের দানাগুলি মুনোয়ারপ্রসাদের কাছে প্রিয় সন্তানের মতো।সে তাদের যাবতীয় খবর রাখে"। [১১]

আর এক অদ্ভুত মানুষ জগলাল। সাপের বিষ সে বাজারে বিক্রি করে দিন গুজরান করে। সাপের গর্তের মুখে বসে সে যেন টের পাই, সেখানে কি সাপ আছে।

> "জগলাল সাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে নাচাতে নাচাতে বলে, 'এ শালে জেনানা সাপ। বহোত তেজ-'।
> সাপটা প্রচন্ড রাগে জগলালের হাত লক্ষ্য করে ছোবল মারে কিন্তু অদ্ভুত এক যাদুকরের মতো তার আগেই হাত সরিয়ে নেয় জগলাল এবং সাপের মুখ গিয়ে পড়ে মাটিতে।তক্ষুণি বিদ্যুৎগতিতে এক হাতে সাপটার গলা, অন্য হাতে লেজের কাছটা টিপে ধরে একটা ছোট্ট ঝাঁপিতে পুরে ফেলে জগলাল। বয়লে, 'গেহুমনের জহরের (বিষ) চটা দাম। চার পাঁচ রোজের জন্যে আর চিন্তা নেই।[১২]

বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত প্রকার ভয়ঙ্কর কাজ-ই হতদরিদ্র এই মানুষদের অবলম্বন করতে হয়।

অন্যদিনের মতোই সবাই জঙ্গলে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল। পরসাদী একটা বড় দা নিয়ে একটা মেটে আলু খুঁড়ে বের করছিল সেই সময় একটা চিতা বাঘের চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখতে পায়। লছমন তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। চিতা বাঘটা তার ঘাড়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ে । সবাই ছুটে আসে তাকে বাঁচাতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না মারা যায় লছমন। তার রক্তমাখা ছিন্ন-ভিন্ন দেহটা দেখতে পেয়ে অসহায় পঙ্গু ছনেরি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু মুঠো ভাতের জন্য লছমনকে শহীদ হতে হোল।

তারপর একদিন জমির সব ধান কাটা শেষ হয়। সবাই মিলে মাঠে নেমে জমিতে পড়ে থাকা ধান একটা -একটা করে তুলতে শুরু করে।

> "ভোরবেলা, রোদ উঠেছে কি ওঠে নি। কুয়াশা কেটেছে কি কাটে নি-ভুখা আধানাঙ্গা মানুষগুলো কাপড়ের ঝুলি আর সরু সরু কাঠি নিয়ে হুড়মুড় করে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ে।" [১৩]

সবাই ধান সংগ্রহ করে খুশি মনে ধান থেকে চাল বের করে ফোটাতে থাকে ভাত।

> " কতকাল পর হাভাতেদের উনুন ধরে, নিজেরাই তা জানে না।চুলার আঁচে তাদের মুখগুলো বড় উজ্জ্বল দেখায়। হো কিষুণজী, কতদিন পর তারা ভাত খাবে।
> কিছুক্ষণ পর টগবগ করে ভাত ফুটতে থাকে। নতুন চালের ভাতের কি প্রাণমাতানো সুগন্ধ। উত্তুরে হাওয়ায় সেই গন্ধ চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
> একসময় ভাত হয়ে যায়। কেউ আর ফেন ঝাড়ে না। তোবড়ানো সিলভারের থালায় গরম ভাত ঢেলে পুজোয় বসার মতো পবিত্র মন নিয়ে সবাই খেতে বসে"। [১৪]

লাখপতিয়া তার বুড়ি শাশুড়িকে প্রাণ ভরে ভাত খেতে দেয়। নিজের ভাগের ভাত-ও সে তাকে খাইয়ে দেয়। নিজে মকাই ভাজা খেয়ে নেয়।

ধানোয়ার তার নিজের ভাত, পঙ্গু কমজোরি মেয়ে ছনেরিকে খাইয়ে দেয়। নিজে দুইখানি কুল খেয়ে পেট ভরিয়ে নেয়। লাখপতিয়া আর ধানোয়ার ঠিক করে যে তারা পরের দিন পেট ভরে ভাত খাবে।

উপন্যাসটিতে শেষ পর্যন্ত ভুখা মানুষগুলো দীর্ঘ খাদ্যের জন্য লড়াই করার পর ভাত খেতে পারে।কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'ভাতের গন্ধ'- শুধুই দরিদ্র,ভুখা কিছু প্রান্তিক মানুষের 'Primary needs fulfillment' জন্য সংগ্রামের ছবিটিকেই প্রকাশ্যে এনেছে-তা কিন্তু নয়।

যে ভাত খাওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে ধানোয়ার- সেই ভাত এক অসহায় কমজোর মেয়েকে সে খেতে দেয়।সেই ধানোয়ার যে চল্লিশ বছরের জীবনে নিজেকে ছাড়া আর করোর দিকেই তাকাবার সময় পায়নি। সে যখন এত কষ্টে অর্জিত ভাত দান করে দেয়, এ-এক অবাক করা মুহূর্ত। আমাদের এক আশ্চর্য মানবিকতার হদিস দিলেন ঔপন্যাসিক। এই বিরল চিত্র খুব কম লেখকই দেখাতে পেরেছেন। 'ভাতের গন্ধ' উপন্যাসে প্রফুল্ল রায়-তা পেরেছেন। যাদের প্রান্তিক বলে আমরা শুধুই করুণা করে গেছি-তারাই একটি সমগ্র উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করে, তাদের ভিতরের মানবিক দিকগুলি যে -দুঃখ,জ্বালা,যন্ত্রণা,ক্ষুধা, দারিদ্র্যের আগুনে প্রত্যহ পুড়েও নষ্ট হয়ে যাই না,তার উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা পৃষ্ঠা ১৭
২। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, মহাশ্বেতা দেবী,ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, পৃষ্ঠা ৮০
৩। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃষ্ঠা ৫৭
৪। ভাতের গন্ধ, প্রফুল্ল রায়, করুণা প্রকাশনী,কলকাতা পৃষ্ঠা ৬
৫। তদেব,পৃষ্ঠা ১৫
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮
৮। তদেব,পৃষ্ঠা ২৭
৯। তদেব,পৃষ্ঠা ৪৬
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৫১
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১
১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৪
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১১০

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১। চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ: আগষ্ট ২০০৬

২। দেবী মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৪, বিংশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬

৩। দেবী মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি-১১০০১৬, চতুর্থ মুদ্রণ:২০০২

৪। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা- বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১৭, এপ্রিল ২০১০

৫। রায় প্রফুল্ল, ভাতের গন্ধ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮১, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০১৪